

জুলিয়েটের জন্য

রিচার্ড ডকিঙ্গ

অনুবাদ: অগ্নি অধিকার

প্রিয় জুলিয়েট,

এখন তোমার বয়স দশ হয়েছে। একটা জরুরী বিষয় জানানোর জন্য এই চিঠি লিখছি। আমরা যা জানি তা কিভাবে জানি- এই সমস্যা কি কখনো তোমাকে অবাধ করেনি? আমরা কোন কিছু জানি কিভাবে? যেমন এই তারাগুলোর কথা ধরা যাক। এরা ছোট্ট বিন্দুর মত আকাশে জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু আসলে এগুলো সূর্যের মত এক একটা বিরাট আগুনের গোলা। এর কোন কোনটা অনেক অনেক দূরে অবস্থিত। আর এরকম এক নক্ষত্র সূর্যকে ঘিরে আমাদের পৃথিবী বলের মত বনবন করে ঘুরছে - এটাইবা আমরা কিভাবে জানি।

প্রশ্নগুলোর উত্তর হচ্ছে 'প্রমাণ'। কোন কিছুকে প্রমাণিত বা সত্য বলার স্বপক্ষে কিছু সহজ উদাহরণ আছে। যেমন দেখা, শোনা, গন্ধ বা স্বাদ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গত অনুভূতিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। নভোচারীরা পৃথিবী থেকে শত শত মাইল দূরের মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন। সেখান থেকে একাধিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে পৃথিবী গোল। খালি চোখেই তা দেখা যায়। নভোচারীরা নিজের চোখে আমাদের সুন্দর এই নীল পৃথিবীকে গোল দেখেছেন। আমাদের চোখ সবসময় যে সব কিছু দেখতে পারে তা নয়। নিখুঁতভাবে দেখতে গেলে চোখের আরও কিছু জিনিসের সাহায্য প্রয়োজন। বাকঝাকে, মিটমিটে, উজ্জ্বল আলোর সন্ধ্যাতারা আকাশে খালি চোখে দেখা যায়। কিন্তু যদি তুমি টেলিস্কোপ দিয়ে দেখো, তাহলে দেখবে সন্ধ্যাতারা আসলে একটি সুন্দর গোলক। একে ভেনাস (শুক্রগ্রহ) বলে। এরকম করে সরাসরি দেখে, শুনে বা অনুভব করে তথ্যগ্রহণ করাকে বলে পর্যবেক্ষণ।

সাধারণত প্রমাণ নিজে পর্যবেক্ষণ নাও হতে পারে। কিন্তু প্রমাণের পিছনে পর্যবেক্ষণ অবশ্যই থাকবে। কেউ 'খুন' হলে সাধারণত তার চাক্ষুষ সাক্ষী থাকেনা। খুনের ঘটনা খুনি নিজে ও আক্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ দেখেনা। কিন্তু গোয়েন্দারা বিভিন্ন দিক ও উপাদান পর্যবেক্ষণ করে এমন সব প্রমাণ সংগ্রহ করেন যেগুলো শুধু একটি দিকেই আঙ্গুল তোলে। যে ছুরিটা ব্যবহার করা হয়েছিল তার গায়ে অপরাধীর আঙুলের ছাপ থেকে যায়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে খুনি ছুরিটা নিজহাতে ধরেছিল। শুধুমাত্র এই চিহ্ন দেখে বলা যাবেনা যে যার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে সেই খুনি। বরং আরও অন্য অনেক প্রমাণ পাওয়া গেলে তাহলে তার সাথে একে মেলানো যেতে পারে। একজন গোয়েন্দা বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন। অনেক রকম প্রমাণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। এই প্রমাণগুলোকে বিভিন্নভাবে তুলনা করে, বিশ্লেষণ করে একটা সমাধান বের করেন।

যারা মহাকাশবিজ্ঞানী তাদের কাজকর্ম অনেকটা গোয়েন্দাদের মত। তারা এই পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে নানারকম পর্যবেক্ষণ শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঠিক কোনটা সত্যি এ বিষয়ে তারা প্রথমে একটি সন্দেহ বা ধারণা চিন্তা করেন (একে Hypothesis বলে)। এরপর বিষয়টি নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে, অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনা করেন। যদি তারা সত্যকে বুঝতে পারেন তাহলে একটি সম্ভাব্য মন্তব্য করেন। একে বলে ভবিষ্যৎবাণী করা। মনে করো, যদি পৃথিবীটা সত্যি সত্যি গোল হয় তাহলে কি ঘটা উচিত? একজন ব্যক্তি যদি একদিকে মুখ করে দ্রুতগত যেতে থাকে তাহলে একসময় সারা পৃথিবী ঘুরে তার আগের জায়গায় চলে আসা উচিত। যদি তোমার হাম হয় তাহলে ডাক্তার কি করেন? তিনি প্রথম দেখাতেই বলে দেন না যে তোমার হাম হয়েছে। তিনি প্রথমে তোমাকে দেখে মনে মনে ধারণা করেন যে তোমার হয়তো হাম হয়েছে। এরপর তিনি চোখ দিয়ে তোমাকে বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। তিনি দেখবেন তোমার মুখে বা হাতে কোন দাগ আছে কি না? তারপর তোমার কপাল গরম কি না তা হাত দিয়ে স্পর্শ করে বুঝবেন। তোমার বুকের ভিতর কফ জমে কোন শব্দ হচ্ছে কি না তা কান দিয়ে শুনবেন (স্টেথোস্কোপের সাহায্যে)। এই ধরণের বিভিন্ন ইন্ডিয়গ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়ার পর তিনি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন যে তোমার হাম হয়েছে। ডাক্তাররা কখনও কখনও রোগীকে আরও নানারকমের পরীক্ষানিরীক্ষা করতে বলেন। রোগীর রক্ত পরীক্ষা বা এক্সরে করার পর তিনি নিশ্চিত হন। এই পরীক্ষাগুলো ডাক্তারের চোখ, কান এবং হাতকে রোগীর সমস্যা বুঝতে সাহায্য করে।

বিজ্ঞানীরাও এই পদ্ধতিতে কাজ করেন। তারাও ডাক্তারদের মত বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জটিল ও দুর্বোধ্য মহাবিশ্বকে বুঝতে চেষ্টা করেন। আচ্ছা, এখন এইসব সন্দেহ, পর্যবেক্ষণ, ইত্যাদির কথা থাক। কোন কিছু বিশ্বাস করার স্বপক্ষে আরও ভাল কিছু কারণ আছে। আমি সেইসব নিয়ে তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই। এগুলো হল ঐতিহ্য, প্রথা, বয়স্ক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ এবং প্রত্যাশা বা ঐশী বাণী।

প্রথমে ঐতিহ্য বা প্রথার কথা বলি। কয়েক মাস আগে টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে আমি ৫০ জন শিশুর সাথে গল্প করেছিলাম। খুব সচেতনভাবে এই শিশুদেরকে বাছাই করা হয়েছিল। বিভিন্ন আলাদা আলাদা ধর্ম থেকে এই শিশুদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে। কেউ খ্রিস্টান, কেউ ইহুদী, কেউ মুসলমান কিংবা কেউ হিন্দু বা শিখ ধর্মের। উপস্থাপক তাদের ধর্মবিশ্বাস জানার জন্য প্রত্যেকের কাছে গিয়েছিলেন। তারা প্রথার কথা বলেছিল। আমিও সেই প্রথার কথা বলছি। শিশুরা তাদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ দেখাতে পারেনি। কোন প্রমাণ ছাড়াই পিতা বা পিতামহের কাছ থেকে পাওয়া ধর্মকে তারা গ্রহণ করেছে। তারা ঠিক এভাবে বলেছে-”আমরা হিন্দুরা এটা বিশ্বাস করি, মুসলমানরা বলেছে আমরা ওটা বিশ্বাস করি, খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করি অন্যকিছুতে”- এরকম।

যদিও তারা বিভিন্ন জিনিসে বিশ্বাস করে তারপরও তারা কেউ সঠিক না। উপস্থাপক এটাকেই স্বাভাবিক ভেবে নিয়েছেন। তিনি ওদেরকে নিজধর্ম নিয়ে পরস্পরের সাথে আলোচনা করতেও বললেন না। কিন্তু তাদের বিশ্বাস কোথেকে এসেছে এই কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম। এর মূল উৎস আসলে প্রথা। তার মানে পিতামহ থেকে পিতা, পিতা থেকে সন্তান এভাবে বিশ্বাস প্রবাহিত হয়েছে। অথবা শতাব্দীকালব্যাপী

হাতবদল হওয়া বই থেকে তাদের বিশ্বাস এসেছে। আর পূর্বপুরুষরা একই জিনিস শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্বাস করে গেছেন। কোনরকম সন্দেহ পোষণ না করেই তারা বিশ্বাসকে মেনে নিয়েছেন। এটাকেই বলে প্রথা (Tradition)।

প্রথাকে নিয়ে একটা সাধারণ সমস্যা আছে। কতদিন আগে মূল গল্পটা তৈরি হয়েছে সেটা কোন বিষয় না। বর্তমান কাল পর্যন্ত সত্যি বা মিথ্যা যাই হোক তা প্রথার মাধ্যমে চলে এসেছে। মানুষ প্রশ্ন না করে চোখ বন্ধ রেখেই তা গ্রহণ করে এবং মেনে চলে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তা সত্যি হয়ে গেল। কোন একটা গল্প শত কেন হাজার বছর বয়স হলেও সত্য হয়ে যায় না।

ইংল্যান্ডের বেশিরভাগ মানুষ চার্চ অব ইংল্যান্ডের দ্বারা ব্যাপ্টাইজ হয়েছে। কিন্তু এটা খ্রিস্টীয় ধর্মের একটা শাখা মাত্র। এছাড়াও আরও অনেক শাখা আছে। যেমন রাশিয়ার অর্থোডক্স, রোমান ক্যাথলিক এবং মেথোডিস্ট চার্চ। তাদের প্রত্যেকের বিশ্বাস ভিন্নরকম। এখনও ইহুদী ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম পরস্পরের চাইতে আলাদারকম। আবার ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যেও বিভিন্নতা আছে। এসব ধর্মবিশ্বাসীরা সামান্য মতপার্থক্যের কারণে যুদ্ধ করতে পিছুপা হয়না। অতএব তুমি হয়তো ভাবতে পারো যে তাদের নিজ নিজ বিশ্বাসের স্বপক্ষে সামান্য হলেও কিছু ভাল প্রমাণ আছে। কিন্তু আসল ঘটনা হল, তাদের বিশ্বাসের উৎস বিভিন্ন রকম সংস্কৃতি বা প্রথা।

আরেকটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বলি। রোমান ক্যাথলিকগন মনে করেন মা মেরি এমনই বিশেষ সম্মানীয় ছিলেন যে তিনি মারা যেতে পারেন না। তাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্য খ্রিস্টানরা এটা মানেন না। তারা বলেন যে মেরি অন্যান্য মানুষের মত এই পৃথিবীতেই মারা গেছেন। এই খ্রিস্টানরা এর বেশি আর কিছু বলেন না। রোমান ক্যাথলিকদের মত মা মেরিকে স্বর্গের রাণী বলেননা। মেরির সশরীরে স্বর্গারোহনের গল্পটা খুব একটা পুরনো নয়। কারণ বাইবেলে এ সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। আসলে বাইবেলে মা মেরি সম্পর্কে খুব একটা বেশি কিছু বলা হয়নি। ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে মা মেরির সশরীরে স্বর্গারোহনের গল্পটি ছিল না। প্রথমে এটা অন্যান্য সব গল্প যেমন 'তুষার রাজকন্যা' গল্পটির মত তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে কয়েকশত বছর পর এটা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। শত শত বছরব্যাপী গল্পটা প্রচলিত থাকার কারণে মানুষ একে মূল্য দিয়েছে। একটি গল্প যত পুরনো হয় মানুষ ততোই তাকে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। সর্বশেষে রোমান ক্যাথলিকদের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই গল্পটা লিখিত হয়। এটা খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। এই তো সেদিন ১৯৫০ সালে। আমার বয়স তখন তোমার মত ছিল। লিখিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে গল্পটা সত্যি। বরং মেরির মৃত্যুর ছয় বছর পরে যখন গল্পটা তৈরি হয় তখন যেমন বানানো ছিল, ১৯৫০ সালেও তেমন ছিল।

আমি এই প্রথা বা ঐতিহ্য সম্পর্কে পরে এই চিঠির শেষে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে বিশ্বাসের অন্য দুই খারাপ অজুহাত 'কর্তৃপক্ষের আদেশ' ও 'প্রত্যাদেশ' সম্পর্কে কিছু বলে নেই।

'কর্তৃপক্ষ' (Authority) এই জিনিসটাকে আমরা খুব মানি। কারণ এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো আমাদের কাছে আসে। আইন বা নীতিগত সমর্থন আমরা এখান থেকে পেয়ে থাকি। রোমান ক্যাথলিক চার্চে

পোপ হচ্ছেন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। যেহেতু তিনি একজন পোপ সেহেতু মানুষ বিশ্বাস করে যে তিনি কোন ভুল করতে পারেন না। ইসলাম ধর্মের মধ্যেও তেমনি দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ আয়াতুল্লাহ হলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা মান্যবর কর্তৃপক্ষ। এই দেশের অনেক মুসলমান খুন করার জন্য তৈরি হয়ে আছে। কারণ এর অনুমতি তারা ঐ আয়াতুল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছে।

এর আগে আমি তোমাকে বলেছিলাম, রোমান ক্যাথলিকরা ১৯৫০ সালে ঘোষণা করে যে মেরির শরীর স্বর্গে তুলে নেয়া হয়েছে এ কথা তারা আগে থেকে বিশ্বাস করে আসছিল। আসলে আমি বলতে চাচ্ছি যে পোপ নিজেই একথা বলেছেন। তিনি নিজে একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। আর পোপ যেহেতু বলেছেন সেহেতু তা অবশ্যই সত্য এবং মান্য। এর কোন যথার্থ কারণ নেই, তারপরও পোপ বলে কথা। অন্য আর কারও কথার চাইতে পোপের কথাকে তোমার বেশি বিশ্বাস করতেই হবে। বর্তমান পোপ (১৯৯৫) তার অনুসারীদেরকে একাধিক সন্তান নেবার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ যদি এই কর্তৃপক্ষীয় নির্দেশকে বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিত তাহলে তা পরিণামে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বয়ে আনত। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে রোগ-ব্যধি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি লেগেই থাকত।

হ্যাঁ, বিজ্ঞানের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেবার সময় আমরা অন্যের উপর নির্ভর করে থাকি। যেমন, আমি নিজে আলো যে এক লক্ষ ছিয়াছি হাজার মাইল বেগে ছুটছে তার প্রমাণ কখনো দেখিনি। আমি এ কথা বইতে পড়েছি। এখানে বইকে আমি 'কর্তৃপক্ষ' বলে মনে করেছি। তবে এটা ওই কর্তৃপক্ষের চেয়ে ভাল। কারণ কর্তৃপক্ষকে তুমি কোন প্রশ্ন করতে পারবেনা। কিন্তু যথাযথ প্রমাণসাপেক্ষে বই লেখা হয় আর ইচ্ছে করলে যে কেউ এই প্রমাণগুলো নিজে নিজে পরীক্ষা করতে পারে। এটা খুবই স্বস্থিদায়ক। কিন্তু মেরির শরীর স্বর্গে তুলে নেয়া হয়েছে এ ঘটনার স্বপক্ষে একটা ছোট প্রমাণও কোন খ্রিস্ট (ধর্মনেতা) দিতে পারবে না।

বিশ্বাসের পক্ষে তৃতীয় খারাপ কারন হল প্রত্যাদেশ বা ঐশী বাণী। মেরির সশরীরে স্বর্গারোহন বিষয়ে যদি পোপকে ১৯৫০ সালে জিজ্ঞাসা করা হত তাহলে তিনি প্রত্যাদেশের কথা বলতেন। তিনি কিভাবে এই প্রত্যাদেশ পেয়েছেন? একটু কল্পনা করে নিতে হবে। একদিন তিনি নিজের ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে প্রার্থনায় বসেছিলেন। ঈশ্বরের কাছে বারবার সাহায্য চাইলেন। নিজে নিজেই অনেক চিন্তা করলেন। তারপর নিজেই এক অনির্দেশ গভীর বিশ্বাসবোধ থেকে নিজ ধারণাকে বিশ্বাস করা শুরু করেন। বিশ্বাসী মানুষ যখন নিজের অন্তরের অন্তঃস্থলে এক গভীর বিশ্বাস বহন করেন, যখন নিজের মনের গহীনে এক ভিন্নরকম অনুভূতিকে চিহ্নিত করতে পারেন আর তখন তারা কোনরকম প্রমাণ ছাড়াই তাকে সত্য বলে মনে নেন। এটাকে তারা 'প্রত্যাদেশ' বা 'ঐশী অনুভূতি' বলে থাকেন। প্রত্যাদেশের দাবী শুধুমাত্র পোপ করেছেন তা নয়, অন্য ধর্মের মানুষরাও প্রত্যাদেশের দাবী করেন। বিশ্বাসের স্বপক্ষে প্রত্যাদেশকে তারা খুব জোরালো প্রমাণ বলে মনে করেন। কিন্তু সত্যিই কি এটা ভালো কারণ?

ধরো, তোমাকে বললাম যে তোমার প্রিয় কুকুরটা মারা গেছে। তাহলে প্রথমে তোমার মন খুব খারাপ হয়ে যাবে। হয়তো তুমি জিজ্ঞাসা করবে 'তুমি কি নিশ্চিত? কিভাবে তুমি জানলে? কিভাবে এটা ঘটল?' এখন ধরি, আমি বললাম - 'আমি আসলে ঠিক জানিনা যে কুকুরটা মরেছে। এর কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। আমার মনের ভিতরে একটা অনুভূতির সৃষ্টি হল যে হয়তো সে মারা গেছে।' তাহলে ভয় দেখানোর জন্য

তুমি আমার উপর কিঞ্চিৎ রেগে যাবে। কারণ তুমি জানো কারো মনের অনুভূতি কেউ মারা যাবার ঘটনা বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট জোলালো ও গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য তোমার সঠিক তথ্য প্রমাণ দরকার। আমাদের প্রত্যেকেই সময়ে সময়ে মনের গভীরে বিভিন্নরকম অনুভূতি বোধ করি। কখনও সেগুলো সঠিক হয় কখনওবা হয় না। বিভিন্নরকম মানুষ প্রত্যেকের চাইতে ভিন্নরকম অনুভূতি বোধ করে। তাহলে কেমন করে তুমি কার অনুভূতিকে সত্য বলে গ্রহণ করবে? তাহলে কুকুরের মারা যাবার ঘটনা আমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি? যে নিজচোখে মৃত দেখেছে তার কাছ থেকে শুনে অথবা নিজে কুকুরের হৃদপিণ্ডের বন্ধ হওয়া পরীক্ষা করে কিংবা যিনি কুকুরটা মারা যাবার সময় উপস্থিত ছিলেন এমন কারো কাছ থেকে জেনে নিয়ে।

মানুষ কখনও কখনও বলে যে নিজের মনের গভীর অনুভবকে বিশ্বাস করতে হবে। না হলে স্ত্রীর ভালোবাসার উপর আস্থা রাখা সম্ভব হবে না। কিন্তু এটা ভুল যুক্তি। কারণ কেউ কাউকে ভালোবাসে কি না তা বোঝার অনেক উপায় আছে। চোখে দেখে ও কানে শুনেও ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মীয় নেতারা যেমন বলেন তেমন এটা শুধুমাত্র মনে গভীরে অনুভবের বিষয় নয়। বাহ্যিক বেশ কিছু চিহ্ন দেখে মনের অনুভূতি বোঝা যায়। চোখের চাহনী, কথার কোমলতা, সহানুভূতি, সহদয়তা, এগুলো সবই সত্যিকারের প্রমাণ।

কখনও কখনও মানুষ কোন প্রমাণ ছাড়াই মনে করে তাকে অন্য কেউ ভালোবাসে। শেষ পর্যন্ত যদিও তা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়, তবুও তারা নিজেদের বিশ্বাসে অটল থাকে। কেউ কেউ মনে করে যে সিনেমার নায়ক (বা নায়িকা = Actor) তাকে ভালোবাসে। যদিও তাদের কখনও দেখা হয়নি। তবুও এমন বিশ্বাস থেকে তাকে টলানো যায় না। এই ধরনের মানুষেরা আসলে মানসিকভাবে অসুস্থ। অন্তর্গত অনুভূতিকে বাইরের কিছু উপাদানের প্রেক্ষিতে প্রমাণ সাপেক্ষ হতে হবে, না হলে তাকে কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যাবে না।

মনের গভীরের অনুভূতি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও খুব প্রয়োজন। কিন্তু এটা শুধুমাত্র পরবর্তীতে প্রমাণের জন্য পরীক্ষণযোগ্য তবে এমন সব আইডিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোন একটা ধারণা যখন খুব সত্যি বলে মনে হয়, তখন বিজ্ঞানীরাও সে সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা পোষন করেন। কিন্তু এটা তারা দীর্ঘসময়ব্যাপী পরীক্ষা চালানোর সুবিধার জন্য করে থাকেন। তারা ঐ দৃঢ় ধারণাকে ভিত্তি করে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে একটি যথার্থ প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন আইডিয়া খুঁজে পাবার জন্য নিজের মনের অনুভূতিকে ব্যবহার করেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রমাণ খুঁজে পান না ততক্ষণ নিজের মনের ভাবনার জন্য কোন দায়বদ্ধতা স্বীকার করেন না।

আবার প্রথার কথায় আসি। এবার আমরা একে ভিন্নপদ্ধতিতে দেখবো। প্রথা বা ঐতিহ্য কেন আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। নিজেদের জন্য উপযোগী পরিবেশে যেন সুস্থভাবে বেচেবর্তে থাকতে পারি সেজন্য প্রাণীরা বিবর্তিত হয়েছে। আফ্রিকার সমভূমিতে সিংহরা খুব ভালভাবে বাঁচতে পারে। ক্রেমাস স্বাদু জলের মাছ, আবার কাঁকড়ারা লবনাক্ত জল ছাড়া থাকতে পারে না। মানুষও একরকম প্রাণী। আমরা এই পৃথিবীতে অন্য মানুষদের সাথে মিলেমিশে বাঁচার উপযোগী করে তৈরি হয়েছি। আমরা সিংহ বা কাঁকড়া মত সাধারণত কোন খাবার শিকার করি না। বাজার থেকে বিক্রেতার কাছ থেকে কিনে নেই। তারা

আবার উৎপাদকের কাছ থেকে কিনে আনে। মাছ যেমন পাখনা দিয়ে জলের মধ্যে ভেসে বেড়ায় আমরা তেমন মানুষের সমুদ্রে সাঁতার কাটছি। অন্য মানুষের সাথে আমরা বিভিন্নরকম সম্পর্ক তৈরি করি। আর এই সম্পর্ক তৈরিতে সাহায্য করে আমাদের বুদ্ধি। সমুদ্র যেমন লবনাক্ত জল দিয়ে ভর্তি, মানুষের পৃথিবীতেও তেমন জানার মত বিভিন্ন জটিল বিষয় আছে। যেমন ভাষা।

তুমি ইংরেজিতে কথা বল, কিন্তু তোমার বন্ধু অ্যান ক্যাথরিন কথা বলে জার্মান ভাষায়। তুমি তোমার নিজস্ব 'মানব সমুদ্রে' সাঁতার কাটার উপযোগী ভাষায় কথা বল। আর কোন উপায় নয় শুধুমাত্র প্রথা বা ঐতিহ্যের মাধ্যমেই ভাষাকে আমরা পেয়েছি। ইংল্যান্ডে পিপ/পেপ (Pepe) বলতে কুকুরকে বোঝায়। কিন্তু জার্মানীতে বলে 'এইন হান্ড'(ein Hund)। এর মধ্যে কোনটাই সঠিক নয় আবার কোনটাই অন্যটার চেয়ে বেশি সত্যি নয়। দুটো শব্দই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। নিজের মত মানব সমুদ্রে সাঁতার কাটার সুবিধার জন্য শিশুদেরকে নিজেদের দেশেই ভাষা শিখতে হবে। নিজের মত মানুষদের সাথে আরও নানাকিছু করতে হলে তাকে অন্য আরও অনেক প্রথা ও ঐতিহ্যকে ব্লিটিং পেপারের মত আত্মস্থ করতে হবে। মনে রাখবে প্রথাগত তথ্য বলতে যা দাদুর কাছ থেকে পিতা, পিতার কাছ থেকে নতুন প্রজন্ম পর্যন্ত চলে এসেছে তাকে বোঝায়। শিশুর মগজকে সব ধরণের প্রথাগত তথ্যগুলোকে পিপাসার্তের মত গলাধকরণ করতে হবে। কোনটা ভাল বা মন্দ তা বাছাই করার সামর্থ্য শিশুদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। তাই তারা ভূত-পেত্নী, জ্বিন-পরী, ডাকিনী, দৈত্য ইত্যাদি বিশ্বাস করা সহ বিভিন্ন আজোবাজে শব্দ শিখে ফেলে।

এটা আসলেই দুঃখজনক। কিন্তু করার কিছু নেই। কারণ শিশুরা তাদের চারপাশের সবরকমের তথ্যকে খুব দ্রুত শিখে ফেলে। বিশেষ করে বড়রা যা বলে তা সত্য-মিথ্যা, ঠিক-বেঠিক যাই হোক তাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে। বড়দের অনেক কথা বেশ তথ্যবহুল এবং বিভিন্ন প্রমাণসাপেক্ষে সত্যি একথা ঠিক। কিন্তু তারা যখন বিভিন্ন অর্থহীন বা বাজে কথা বলে তখন তা শেখা থেকে শিশুদের বিরত রাখার কোন উপায় নেই। এখন ওই শিশু যখন বড় হবে তখন সে কি করবে? সেও ছোটদেরকে একই কথা বলবে। তাই বলছিলাম, যখন কোন কিছু গভীরভাবে বিশ্বাস করা হয় তা সে যতই মিথ্যা হোক কিংবা বিশ্বাস করার মত কোন কারণ থাক বা না থাক, তা ছড়িয়ে পড়ে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়ে যায়।

ধর্মের ক্ষেত্রেও কি এমনটাই ঘটেছে? সৃষ্টিকর্তা, স্বর্গ, মেরির মারা না যাওয়া, যিশুর পিতা কোন মানুষ নয়, প্রার্থনার উত্তর পাওয়া যায়, ওয়াইন রক্তে পরিণত হয় - এসবের কোনটার পিছনে কোন ভাল প্রমাণ নেই। তারপরও লক্ষ লক্ষ মানুষ এতে বিশ্বাস করে। এর কারণ হয়তো শৈশব কৈশোরে যখন সবকিছু বিশ্বাস করার মত তাদের বয়স ছিল, তখন বড়রা এসব বিশ্বাস করতে বলেছিল।

লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধারণায় বিশ্বাস করে কারণ শৈশবেই তারা ভিন্ন ভিন্ন ধারণার কথা শুনেছে। একটি খ্রিস্টান শিশুর চাইতে মুসলিম শিশুর অভিজ্ঞতা ভিন্নরকম। দুজনই এমনভাবে প্রভাবিত হয়ে বড় হয়েছে যে তারা নিজেদের সঠিক ও অন্যদেরকে বেঠিক বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। এমনকি খ্রিস্টান, রোমান ক্যাথলিক, চার্চ অব ইংল্যান্ড, বিশপশাশিত গির্জা, মরমন প্রমুখেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ধারণায় আস্থা রাখে। আবার তারা নিজেদের সম্পূর্ণ সঠিক ও অন্যদের প্রত্যেককে ভুল বলে মনে করে। তুমি যে কারণে ইংরেজি আর অ্যান যে কারণে জার্মান বলে ঠিক একই রকম কারণে তারা ভিন্ন ভিন্ন ধারণায় বিশ্বাস করে। নিজ নিজ

দেশে ইংরেজি বা জার্মানভাষা সঠিক। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম নিজের দেশে সঠিক নাও হতে পারে। কারণ প্রত্যেক ধর্ম অন্য ধর্মকে মিথ্যা বলে প্রচার করে। কোন দেশে মেরি মরতে পারেনা আবার কোন দেশে মেরি সম্পূর্ণভাবে মৃত। মেরি আয়ারল্যান্ডের দক্ষিণের ক্যাথলিক শাসিত দ্বীপে অমর নন, কিন্তু উত্তরের প্রটেষ্ট্যান্ট মতাবলম্বীদের কাছে মৃত।

আমরা এই সব বিষয় নিয়ে কি করব? আসলে আমাদের করার তেমন কিছুই নেই। তুমিও কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তুমি একটা জিনিস করতে পার। এরপর থেকে কেউ যদি তোমার সামনে কোন কিছুকে গুরুত্বপূর্ণ বলে, তাহলে তুমি নিজেকেই প্রশ্ন করবে-"এটা কি প্রমাণ সাপেক্ষ বক্তব্য? নাকি, প্রথা বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অথবা প্রত্যাদেশের কারণে বিশ্বাসযোগ্য।" এর পরে কেউ যদি তোমার সামনে কোনকিছুকে সত্য বলে, তাহলে তুমি জিজ্ঞাসা করবে - "কি ধরণের প্রমাণ আপনার কাছে আছে?" তারা যদি এর কোন সন্দেহ দিতে না পারে, তাহলে আমি আশা করবো তাদের কথা বিশ্বাস করার আগে খুব সতর্কভাবে বিচার করবে।

তোমার বাবা

উপরের লেখাটি তাঁর মেয়ে জুলিয়েটের দশম জন্মদিন উপলক্ষে রিচার্ড ডকিঙ্গের লেখা চিঠির অনুবাদ। Good and bad reasons for Believing শিরোনামের মূল ইংরেজী লেখাটি পরে ডকিঙ্গের বই A Devil's Chaplain- এ অন্তর্ভুক্ত হয়।

ড. রিচার্ড ডকিঙ্গ, আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী বিজ্ঞানী, গবেষক এবং দার্শনিকদের অন্যতম। পেশায় বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। যুক্তিবাদী এবং সমাজসচেতন লেখালিখির কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ড. রিচার্ড ডকিঙ্গের খ্যাতি আজ আক্ষরিক অর্থেই তুঙ্গস্পর্শী। 'ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার', 'সেলফিশ জিন', 'আনোয়েভিং দ্য রেইনবো', 'ক্লাইমিং মাউন্ট ইম্প্রোবেবল', 'ডেভিলস চ্যাপ্লেইন' এবং 'অ্যাঙ্গেলসটর টেল' সহ অসংখ্য পাঠকনন্দিত জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞানভিত্তিক বইয়ের রচয়িতা। সম্প্রতি নিজ উদ্যোগে তৈরী করেছেন 'রিচার্ড ডকিঙ্গ ফাউন্ডেশন'। তাঁর সর্বশেষ বই - 'দ্য গড ডিলুশন' এখন পর্যন্ত বিগত বাইশ সপ্তাহ ধরে নিউয়র্ক টাইমসের 'বেস্ট সেলার' তালিকায় রয়েছে।

অগ্নি অধিরূঢ়, বাংলাদেশে বসবাসরত মুক্তমনার নিয়মিত লেখক। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ইমেইল - agniadhirurho@gmail.com